প্রথম আলো

ভ্রমণ

হিবিসকাস মানে হলো জবা ফুল

মাদাগাস্কারে গিয়েছিলেন বাংলাদেশি চার সাইক্লিস্ট। আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রটিতে সাইকেলে ঘুরে দারুণ দারুণ সব অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন **মুনতাসির মামুন**। আজ পড়ুন দ্বাদশ পর্ব

ছুটির দিনে ডেস্ক

হোটেল হিবিসকাস *ছবি : সংগৃহীত*

যখন যা চাওয়া হয়, বিধাতা কি তার উল্টোটা করে পরীক্ষা নেন? মাদাগাস্কারে সাইকেল অভিযাত্রার শুরুর দিকে রাস্তা

ফুরাতে প্রায় জীবন দিতে হতো। আর আজ? এই শেষ দিকে এসে রাস্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে হু হু করে।

ডান দিকে একটা সাদা রঙের সিমেন্টের তৈরি রোড সাইন। শুধু 'মোহাম্বো' লেখাটা ধরতে পারলাম। বাকি সব ফরাসিতে লেখা। তার এক ধারে ফরাসি, আরেক ধারে মাদাগাস্কারের পতাকা। ঠিক যেমন বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর ফলকে দুই দেশের পতাকার সঙ্গে কত কিছু লেখা থাকে, তেমন। থামলাম। ঘটা করে ছবি তুললাম। সাইকেলের মিটার দেখাচ্ছে, আমরা ৩০ কিলোমিটার চলে এসেছি। বাজে কেবল সাড়ে ১০টা। আজ যেন রাস্তাই হাঁটছে, আমরা হাঁটছি না।

অপর দিক থেকে দুজন সাইক্লিস্টকে দেখা গেল। বরাবর এসে থেমে গেলাম সবাই। তাঁরাও আমাদের মতো সাইকেলে মাদাগাস্কার দেখতে বেরিয়েছেন। কিন্তু সাইকেল আর তাঁদের উরু পর্যন্ত কাদা দেখে ভড়কে গেলাম। কোনো কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকে গিয়েছিলেন তাঁরা! না, কোনো দুর্ঘটনা নয়। তাঁরা উত্তর দিক থেকে এসেছেন। আমরা যে পর্যন্ত আজ যেতে চাই, সেদিক থেকে। রাস্তার অবস্থা এতই নাকি খারাপ যে হেঁটে আসতে হয়েছে বেশির ভাগ সময়। বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা কাদা-জলে একাকার। চালানোর কোনো জো নেই। তাঁদের সাইকেলগুলো মাউন্টেন বাইক। মোটা চাকার এই সাইকেলগুলো তৈরিই হয়েছে এমন কাজের জন্য। আমাদের সাইকেল দেখে এককথায় মানা করে দিলেন এগোতে। সামনে কিছু হোটেল আছে। ওখানে থাকা যাবে। উত্তরমুখী না হয়ে কোনো একটা হোটেলে থেকে আগামীকাল তমাসিনার রাস্তা ধরতে বললেন। তাঁরাও তা-ই করছেন।

ছয় কি সাত কিলোমিটার হবে, 'হোটেল হিবিসকাস' লেখা সাইনবোর্ড দেখলাম। হিবিসকাস মানে হলো জবা ফুল। আনতানানারিভোর যে হোটেলে উঠেছিলাম, তার মালিক এই হিবিসকাসের কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমরা যেহেতু এগিয়ে যাব, তাই আর গা করা হয়নি। এখন তো দেখা যাচ্ছে, এখানেই থাকতে হবে। পরিচিত নাম বলে হিবিসকাসের দিকেই রওনা হলাম। দেখি, কী আছে!

রাস্তা থেকে ডানে নেমে হোটেলের সাইনবোর্ড যেদিকে যেতে বলছে, সেদিকে এগোতে থাকলাম। বৃষ্টি হওয়ায় বালু শক্ত জমাটবাঁধা থাকলেও চাকা দেবে যাচ্ছে। এগুলো ঠিক মিহি বালু নয়, নুড়ি বা কঙ্কর, ঝরঝরে, যা এ ধরনের সাইকেলের জন্য কঠিন। হাঁটাই ভালো। উত্তর দিকে আর যাওয়া না গেলেও তমাসিনা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তাই সাইকেলের কাজ এখনই শেষ নয়।

এই রাস্তায় শেষ কবে গাড়ি চলেছে, বোঝা গেল না। নুড়িমেশানো মাটির রাস্তার দুই ধার দেবে গেছে। আমরা এমনই এক দেবে যাওয়া জায়গা ধরে সাইকেল ঠেলছি। ঢাল ঠেলার চেয়ে কম নয়। কষ্ট হচ্ছে, কারণ চাকা বেশি দেবে যাচ্ছে এখন। পরগাছা গুল্ম এগিয়ে এসে গায়ে ঘষা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। একটু তো ভয় করছেই, কোন চিপায় যে যাচ্ছি। এমন রাস্তা কোনো ভালো হোটেলের কি হতে পারে? দোটানা আছে কিন্তু এখনই ফিরে যাব? ভাবতে ভাবতেই একটা জরাজীর্ণ গেট পেলাম। কিছু একটা আছে, তবে হোটেলের মতো কিছু দৃশ্যমান হলো না। সাগরের গর্জন খুব জোরালো। সামান্য এগিয়ে ডানে হালকা মোড় নিতেই আরেকটু ডানে সরে শণের চালের বিশাল হোটেল পড়ল। সামনে আরও বড় ঘন ঘাসের জমিন। বড় বড় কয়েকটা গাছ, যার গুঁড়ির বেড় হবে কম করে পাঁচ ফুট। ছাউনির মতো করে ঢেকে রেখেছে পুরো জমিন। প্রথম যে অবকাঠামো দেখলাম, সেটা মনে হয় খাবারের জায়গা বা রেস্তোরাঁ। একদম খোলা, পাকা

মেঝের ওপর কয়েকটা টেবিল-চেয়ার। আরাম করে বসার জন্য সোফা আর একটা ডেস্ক। অফিসের মতো করে সাজানো। তবে অনেক দিন যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তা বোঝা গেল। একজন তরুণী এগিয়ে এলেন কোথা থেকে। যাক বাবা, কেউ তো আছে। এতক্ষণ তো মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত, ছেড়েছুড়ে চলে গেছেন সবাই।

এখানেও কটেজ। ভাড়া ২ হাজার ৫০০ টাকা। সাগর গুনে গুনে ৫০ কদম। বাঁশ-কাঠের ঝুপড়ির কটেজ। এমন হোটেলগুলোকে মনে হয় রিসোর্ট বলে। সাগরের গর্জন ছাড়া আর কিছু নেই। গাড়ি নেই, বাড়ি নেই, দোকান নেই—জনমানবহীন নিরালা। আমরা চার প্রাণী আর হোটেলকর্মী এই তরুণী। আরও মানুষ আছে কোথাও, তবে দেখতে পেলাম না। জুতা ছুড়ে ফেলে খালি পায়ে আরাম লাগছে বেশি। কটেজগুলো ঘাসের জমির ওপর। সৈকত এসে মিশে গেছে ঘাসের সঙ্গে। ঘাসের জমিন এগিয়ে সৈকত যেখানে শুরু, সেখানে শামিয়ানা টানানো। নিচে দুটি টেবিলে ছয়টা চেয়ার। বাতাসে পতপত পতাকার মতো উড়ছে শামিয়ানা।

সৈকতে এসে দেখা গেল আরও হোটেল আছে, তবে দূরে। এই হিবিসকাসের মতোই। জেলেদের নৌকা ডাঙায় ভেড়ানো। জাল টেনে তুলছেন ওই দূরে কয়েকজন। একজন নারী এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। মাথায় নীল একটা গামলা। প্রথমে ভেবেছিলাম, শামুক-ঝিনুক ফেরি করছেন হয়তো। আসুক।

এলোমেলো যে যার মতো হাঁটাহাঁটি করছি। গামলায় মাছ। তরতাজা। কেবলই ধরা হয়েছে সাগর থেকে। তাই দেখে এগিয়ে এলাম। বাংলাদেশের মাছই আমি ভালো করে চিনি না। এই মাছ তো দূরের কথা। কিন্তু শামিমা আপা বললেন, ভালো হবে যদি কিনে নেওয়া যায়। দুপুরে খাওয়া যাবে। প্রায় এক ফুট লম্বা হবে, এমন দুটি মাছ নেওয়া হলো জলের দামে। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০০ টাকা মাত্র। কক্সবাজার কেন, সেন্ট মার্টিনে এর দাম হাজারের ওপরে যাবে। ফিশ ফ্রাই করে দেবে হোটেল থেকে। সঙ্গে আলু ভাজি আর বিখ্যাত মালাগাছি সবুজ মরিচের সস। এই হলো মেনু। মাছ নিয়ে রান্নাঘরে রেখে তরুণী শামিয়ানার নিচে টেবিল সাজিয়ে দিয়েছেন। বাতাসে টেবিলের কাপড় উড়ে যাওয়ার দশা। থালা-বাটি দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা। আধঘণ্টা পর খাবার আসবে।

মোহাম্বোর সৈকতে *ছবি : সংগৃহীত*

আমরা সাফসুতরো হতে গেলাম।

সামনে আরও কয়েক দিন আছে, তবে এভাবে উন্মুক্ত বিশাল ভারত মহাসাগরের সৈকতে, বাহারি শামিয়ানার নিচে বসে খাওয়া জীবনে আর কখনো হবে বলে মনে হচ্ছে না। খাবার যা দিয়েছে, তা মাওয়া, আরিচা বা চাঁদপুর ঘাটেও পাওয়া যাবে। মাছ আলাদা হতে পারে, স্বাদে আলাদা হতে পারে—এই মাছ ভাজা তো মাছ ভাজাই, সে যে মাছই হোক । আলু ভাজিও আলু ভাজি। কিন্তু এই যে পরিবেশ, তা অতুলনীয়। আবেশ বলে যে ব্যাপার থাকে, তা এখানে পরিপূর্ণ। অনাড়ম্বর নয় কোনো কিছু। সাদা প্লাস্টিকের টেবিল-চেয়ার বাংলাদেশের যেকোনো কোণে দেখা যাবে। থালা, বাটি, তৈজস—সবই সাধারণ। অসাধারণ হলো পরিবেশ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। স্থানীয় কিছু লোককে দেখলাম লগি-বইঠা-জাল-খালই নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। শুধু মানুষ নয়, পাখিরাও ফিরছে নীড়ে। অন্ধকারে ভয় সবার। কটেজে ফিরে এলাম আমরাও। একেবারে সৈকত লাগোয়া। কাল রিটোর বাড়িতে থাকার ইচ্ছা। ফোনে নিশ্চিত করা হলো। ৭০ কিলোমিটার কাল। হয়ে যাবে আরামসে।

Sign in

Newest

Share

Share your thoughts…

POST

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো